তারিখ: 24 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যায়যায়দিন

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে ইতিবাচক

বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ শিক্ষার হার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এটি বর্তমান সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অন্যতম। এ লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশকে সহায়তা করে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইইউ বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে সহায়তা দেয়া শুরু করে ১৯৯৩ সালে। তখন থেকে দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, শিশুদের যথাযথ পুষ্টির চাহিদা মেটানো এ সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, নানাবিধ সহায়তা সত্ত্বেও আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সত্যিকার অর্থে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাওয়া খুবই মুশকিল। নানান আর্থসামাজিক অবস্থার কারণে প্রাথমিক স্তরেই শিশুদের শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। জীবন-জীবিকার তাগিদে শিশুর শিক্ষাগ্রহণ বলতে গেলে অসমাপ্তই থেকে যায়। একদিকে দেশে শতকরা হারের হিসাবে সাক্ষরতার হার বাড়ে, অন্যদিকে কিন্তু স্কুলে গিয়েও শিশুরা ঝরে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে একটা বৈপরীত্য থেকেই যায়। ঝরে পড়ার পেছনে যেসব কারণ বিদ্যমান, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে দারিদ্র্য। এছাড়া অনগ্রসর এলাকায় মেয়ে-শিশুদের, বিশেষ করে, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর মেয়েদের নানারকম নিরাপত্তার অভাবও এক্ষেত্রে জড়িত। শিশুদের ঝরে পড়া রোধ করা গেলে বাস্তবিক অর্থে দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ত। আশার কথা যে, দেশের খাদ্য নিরাপত্তাহীন অঞ্চলের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ানো এবং শিশুদের পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলোতে 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' প্রকল্প নেয়া হয়েছে। যা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিতও হয়েছে। এটি ইতিবাচক উদ্যোগ বলে আমরা মনে করি।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শিশুদের ধরে রাখতে, ঝরে পড়ার হার কমাতে উপবৃত্তির সংখ্যা বাড়ানোসহ নানা ইনসেনটিভ জোগানোর কথা চিন্তা এবং কিছু ক্ষেত্রে এসব বাস্তবায়িতও করছে সরকার। এছাড়া দেশের কোনো কোনো বিদ্যালয়ে 'স্কুল ফিডিং' কর্মসূচিও চালু আছে। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও ইউরোপীয় কমিশনের সহায়তায় প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ের শিশুদের মাঝে বিস্কুট বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচি শিশুদের ঝরে পড়া রোধে কতটুকু ভূমিকা রাখছে সে তথ্য আমাদের কাছে না থাকলেও বলা যায়, এ ধরনের কর্মসূচি শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক হতে পারে।

আমরা মনে করি এ ধরনের কর্মসূচি সর্বজনীন না হলে নানা ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাল বা গম বিতরণের সময় একই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। সব শিক্ষার্থীকে যেমন দেয়া হতো না, তেমনি স্বল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি চালু করায় বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্যের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চাল বিতরণের কর্মসূচি বন্ধ করে সরকার শিশু শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের মাঝে টাকা বিতরণ শুরু করে। এতেও যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়নি তেমনটিও নয়। আমরা আশা করি, এসব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বৈষম্যের অভিযোগ উঠলে কর্মসূচির সফলতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। সঙ্গত কারণে সরকারের এ বিষয়ে ব্যাপক সতর্কতা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আবার যেহেতু শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ক্ষীণদৃষ্টি, ক্ষীণশ্রবণ, কথোপকথনে অসুবিধাগ্রস্ত ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও সরকারকে ভাবতে হবে। জানা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রায় অর্ধেক শিশু পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করতে পারে না। এটা একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের খুব সুখকর চিত্র নয়। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে অর্থবহ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে এ চিত্রের আমূল পরিবর্তনের বিষয়টিই সামনে চলে আসে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব মহলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই।

এসব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বৈষম্যের অভিযোগ উঠলে কর্মসূচির সফলতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। সঙ্গত কারণে সরকারের এ বিষয়ে ব্যাপক সতর্কতা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।